

বিজ্ঞান সাধক

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

পূর্ণেন্দু রায়

বিজ্ঞান সাধক

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

4'6
31

৪৩৫

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, [illegible] রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বিজ্ঞানসাধক

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

"সত্যিকার শিক্ষার্থী খ্যাতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও আধিপত্যের জন্য লালায়িত নন। জ্ঞান ও সত্যের জন্য তিনি লালায়িত। সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি সত্যপথ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি মনে করেন জ্ঞানের সাধনা মানুষের সর্বোত্তম কর্তব্য।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

"What Tagore is in the World of letters and what Gandhi is in the World of Spirit; Sri J. C. Bose is in the world of Science."

—Lord Hailey, sometimes Governor of United Providces of Agra and Oudh (Now Utter Pradesh).

"সাহিত্যের জগতে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মশক্তির ক্ষেত্রে যেমন মহাত্মা গান্ধী, বিজ্ঞানের অঙ্গনে তেমনি আচার্য জগদীশচন্দ্র।"

—আগ্রা অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ)-এর রাজ্যপাল লর্ড হেইলী

"ডঃ বসু পৃথিবীকে কয়েকটি অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন উপহার। তাঁর যে কোন একটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা যায়।"

—আইনষ্টাইন

"জগদীশচন্দ্র—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ !"

—বার্নার্ড শ'

"একটি নূতন জগতের আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র !"

—রোমাঁ রোলাঁ

"ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য, আচার্য জগদীশ !"

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানসাধক
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

"ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে: কোথায় আমার বন্ধুবান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এস। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ি যদি চিনিতে না পার, এজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙ্গীন পাপড়িগুলো দূর হইতে দেখিতে পাইবে।" লিখেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

উদ্ভিদের মুখে তিনি দিয়েছেন ভাষা। কথা বলে গাছ প্রাণীর সাথে। আমরা বুঝিনি সে ভাষা কোন দিন। সে ভাষা অনুভব করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অভিনব। আজীবন সাধনায় তিনি বিজ্ঞান জগতে নতুন নতুন তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। জীবতত্ত্বে, শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ তাই স্মরণ করে লিখেছেন:

সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী
রেখে ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে
পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতে উদ্ভিদ, জীব আর ধাতুর জগৎ এক। নিজের হাতে খুব ছোট ছোট যন্ত্র তৈরি করে তিনি প্রমাণ করলেন—

মানুষের মত উদ্ভিদেরও আছে অনুভবশক্তি। গাছ জন্মায়, বড় হয়। মানুষের মত মরে।

জগদীশচন্দ্রের হাতে তৈরি 'ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্র (আবিষ্কার—১৯১৭) প্রমাণ করেছে এ কথা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা বিশ্ব আজও আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্ভাষণ করে—

"……অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি…… !"

*   *   *   *

তারপর ধাতু। ধাতু সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ঘোষণা যুগান্তকারী। তাঁর মতে ধাতু শক্তিধর এবং তার মৃত্যু আছে, আছে জীবনও। মরফিয়া পাথরের গায় দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে পাথরের গা কুঁচকে যায়।

তাঁর এই অভিনব বৈজ্ঞানিক অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন :

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক
জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা
সব সাধনার বাড়া !

*   *   *   *

লজ্জাবতী লতা আঘাতে সাড়া দেয়। বড় গাছও আঘাতে সাড়া দেয় কিন্তু তা আমরা দেখতে পাই না। জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে আঘাতে সাড়া দেয় বড়-ছোট সব গাছ।

লজ্জাবতী লতার সাড়া প্রত্যক্ষ সাড়া কিন্তু বড় গাছের সাড়া

অপ্রত্যক্ষ সাড়া। এই সাড়া জগদীশচন্দ্র ধরলেন বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে। তিনি লক্ষ্য করলেন আহত স্থান থেকে সুস্থ স্থানের দিকে চলে বিদ্যুৎপ্রবাহ।

জগদীশচন্দ্রের প্রধান কথা—জীব, জড় ও উদ্ভিদ সমধর্মী। সকলেই ছোট ছোট অণুদ্বারা গঠিত। আলো ও তাপের উত্তেজনায় অণুগুলোর বিকৃতি হয়। ফলে গাছের সাড়া হয়!

আঘাত বেশী হলে প্রবাহের মাত্রা বা শক্তি বেশী হয়। আহত স্থান সুস্থ হতে থাকলে বিদ্যুৎ প্রবাহও কমে। জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা গাছের অপ্রত্যক্ষ সাড়া লক্ষ্য করেন।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রধান কৃতিত্ব—উদ্ভিদের দুরূহ জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটন। ইউরোপের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

*　　*　　*

বেতারে তার-বার্তা প্রেরণের সম্ভাবনার কথা জগদীশচন্দ্রের মনে প্রথম উদিত হয়। বিজ্ঞান-সাধনার প্রথম জীবনে অর্থের অভাবে মার্কনির আগে ইউরোপ থেকে বেতার আবিষ্কারকের স্বীকৃতি আনতে তিনি পারেন নি—এ দুঃখ ভারতবাসী ভুলতে পারবে না কোনদিন।

*　　*　　*

অদৃশ্য আলোক ও বিদ্যুৎ তরঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্বও জগদীশচন্দ্রের প্রাপ্য।

*　　*　　*

গবেষণার যন্ত্রপাতি সব তাঁরই উদ্ভাবিত। জীবের হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষার যন্ত্র "গ্যালভানোমিটার"। উদ্ভিদের অনুভব-শক্তি প্রমাণের

জন্য "ক্রেস্‌কোগ্রাফ", গাছের সাড়া লিখে রাখবার জন্য 'স্বয়ং লেখ' যন্ত্র ও বেতারের যন্ত্র "ক্রিষ্টাল" সেট জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্র।

* * *

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে (আগেকার আপার সারকুলার রোড) ১৯১৭ সালে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-শিক্ষার কেন্দ্র ও গবেষণাগার 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' (বোস ইনষ্টিটিউট), তাঁর উদ্ভিদের জু "মায়াকানন" কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরবর্তী তাঁর ফলতার সিজবাড়িয়ার উদ্যানবাটি, দার্জিলিং-এ তুষার-শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে (তাঁর গ্রীষ্মাবাস 'মায়াপুরী' তাঁর সৃষ্টি।

তাঁর আবিষ্কার এ গবেষণা বিজ্ঞান, কৃষি ও চিকিৎসা শাস্ত্রকে উন্নতির পথে এনেছে। এনেছে নতুন আলো। সাধারণ আবিষ্কারক ও বৈজ্ঞানিক নন জগদীশচন্দ্র। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সারিতে নিউটন, গ্যালিলিও প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের স্থান, সেই সারিতে জগদীশচন্দ্রের স্থান।

শ্রীবিশ্ব

॥ বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

বংশ পরিচয় ও বাল্যকাল ॥

[জন্ম ঃ ৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮। মৃত্যু ঃ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৭]

বিক্রমপুর ঢাকা জেলার একটি বিখ্যাত অঞ্চল। পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান বিক্রমপুর। বর্তমানে ইহা বাংলাদেশের অন্তর্গত।

বিক্রমপুরের একখানি গ্রাম রাড়িখাল। রাড়িখালের বসু পরিবার বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। এই পরিবারে জগদীশচন্দ্রের জন্ম।

দক্ষিণ-রাঢ়ী বসু পরিবার। বসুরা কায়স্থ বংশ-সম্ভূত। দক্ষিণ-রাঢ়ী বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দশরথ বসু।

দশরথ বসুর দুই পুত্র—কৃষ্ণ ও পরম। কৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে থাকেন কিন্তু পরম পূর্ববঙ্গে চলে যান। প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা সে।

পরমের বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে বাস করতে থাকেন। এই শাখায় জগদীশচন্দ্রের জন্ম। বিখ্যাত বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর তারিখে। সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই।

পিতা ভগবানচন্দ্র ছিলেন প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের লোক। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা। চিত্তরঞ্জন দাশের বংশের সাথেও ছিল তাঁর সম্পর্ক। চিত্তরঞ্জনের জ্যাঠতুতো বোন অবলার সাথে জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হয়।

ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বিদেশী সরকারের অধীনে বড় চাকুরী করলেও মন ছিল তাঁর স্বদেশী ভাবাপন্ন। দেশের কল্যাণ চিন্তায় তিনি নিয়ত রত থাকতেন।

দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য ভগবানচন্দ্রের ছিল প্রচুর দান। দেশের কল্যাণকর কার্য শুধু ছিল না তাঁর স্বপ্ন! দেশের উন্নতির জন্য তিনি হাতে-কলমে কাজ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে।

ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে দরিদ্র কৃষকদের কৃষি ও শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রচারের জন্য তিনি ফরিদপুরে স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন।

আসামের চা বাগান ছিল সাহেবদের হাতে। এর জন্য ভগবানচন্দ্র অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হন। তিনি নিজের টাকায় চাবাগানের পত্তন করেন।

তিনি বুঝেছিলেন শিল্প-শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। নিজ ব্যয়ে তাই প্রতিষ্ঠা করেন টেক্‌নিক্যাল স্কুল। এই সব কাজে ভগবানচন্দ্রকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তিনি সর্বস্বান্ত হন। তাঁর প্রচেষ্টাও সফল হয় না। পিতার ব্যর্থ জীবনের মধ্যে যে স্বদেশ-প্রেম, কর্মনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের বিরাট আদর্শ ছিল তা পুত্র জগদীশচন্দ্র অনুধাবন করেন। পিতার আদর্শ হয় পুত্রের শিক্ষা ও দীক্ষা।

মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ পিতার আদর্শ থেকে লাভ করেন জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার সাফল্যের মূলে ছিল এই অনুরাগ। এই ছিল তাঁর উদ্দীপনা, প্রেরণা। বিজ্ঞানসাধনায় ভারতবাসী অমনোযোগী—পাশ্চাত্য জগতে ভারতবাসীর এ অপবাদ স্বদেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের কাছে ছিল অসহনীয়। আজীবন বিজ্ঞান-সাধনায় যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন।

পিতা ভগবানচন্দ্রের জাবনাদর্শ জগদীশচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত হয়। স্বদেশী কাজে পিতা ভগবানচন্দ্র সর্বস্বান্ত হন। পুত্র জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিবেদিত হন। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বিস্ময়কর কীর্তি। পিতা ভগবানচন্দ্রের স্থাপিত টেক্‌নিকাল স্কুলে যন্ত্রের সাথে বালক জগদীশচন্দ্রের মনের যোগসূত্র গ্রথিত হয়।……

বিজ্ঞান সাধনার মূলে হ'ল সার্থক উদ্দীপনা, জানবার আগ্রহ।

জগদীশচন্দ্রের বাড়ির নীচে প্রবাহিতা ছিল পদ্মানদী। নদীর কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে বালক জগদীশচন্দ্র লাভ করেন জ্ঞানস্পৃহা। নদীর মূল কোথায়? নদীর শেষ কোথায়? এই প্রশ্নের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের জন্ম।

শিশু জগদীশচন্দ্র ও প্রবাহমানা পদ্মার মধ্যে সে এক অভিনব সম্প্রীতি! জগদীশচন্দ্র স্বরচিত "অব্যক্ত" পুস্তকে "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধে এই সম্প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

"একবার এই নদীতীরে আমার একা প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার এই আজন্ম পরিচিত বাৎসল্যের রাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল। যে যায় সে তো আর ফিরে না, তবে কি সে অনন্ত কালের জন্য লুপ্ত? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? যে যায় সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?"

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে

পাইলাম "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই।" "দীর্ঘ প্রবাসের পর আমরা উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছ নদী?

নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ। আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া আসিব।"

ভবিষ্যতে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বাল্যজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল পিতা ও পদ্মা।

এছাড়া আরও প্রভাব ছিল বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বালক জীবনে। একজন হ'ল তাঁর পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং আর একজন হ'ল ধীবর পুত্র। তাছাড়া ছিল পিতার ভৃত্য দীনু ডাকাত।

দীনু আগে ছিল ডাকাত। পরে জেলখানার কয়েদী হয়—অবশেষে মুক্তির পর পিতার ভৃত্য। তাদের কাছে বালক জগদীশচন্দ্র শুনতেন পক্ষী ও জলজন্তুর কাহিনী।

প্রাণী সম্বন্ধে একদিন বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব জগৎ সভায় ঘোষণা করেন। এর মূলে ছিল সেদিনকার সে সব কাহিনী যার মাধ্যমে বাল্যকালেই প্রাণী-জগতের সাথে তাঁর মানসিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

আর ছিল সরল গ্রাম্য পরিবেশের প্রভাব বালক জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবনের উপর। উদ্ভিদ ও জড়ে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার করে

যিনি একদিন বিশ্ববাসিগণকে স্তম্ভিত করেন তাঁর বৈজ্ঞানিক মন গড়ে উঠে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে।

প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন নিয়ে তাঁর আজীবন সাধনার মূলে প্রকৃতির সাথে তাঁর মানসিক সম্পর্ক।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই একদিন বিশ্ববিশ্রুত আবিষ্কারককে সাধু সম্ভাষণ জানাতে বললেন :

হে তপস্বী তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে,
অরণ্যের অন্তর বেদনা শুনেছ একান্তে বসি ;
মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি,
প্রসরিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে
আঁকাবাকা জন্ম-মরণের দ্বন্দ্বে,
তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।

স্কুল-শিক্ষা

[১৮৬৭-৭৩]

গ্রামের বাংলা স্কুলের পাঠ শেষ করার পর জগদীশচন্দ্র পরবর্তী শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স ন' বৎসর। মাস তিনেক পরে এ স্কুল বদলি হ'ল। ভাল ইংরেজী শিক্ষার জন্য জগদীশচন্দ্র ভর্তি হলেন মিশনারিদের স্কুল সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে।

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্রের পিতার হ'ল পদোন্নতি। তিনি তখন বর্ধমান ডিভিসনের সহকারী কমিশনার। কলক্যতা থেকে মাঝে মাঝে বর্ধমানে জগদীশচন্দ্র যাতায়াত করতেন।

সাত বছর পর……

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে জগদীশচন্দ্র ষোল বছর বয়সে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

॥ কলেজ শিক্ষা—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ॥

[১৮৭৪-৭৮]

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জগদীশচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজ হোস্টেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পর ইংরাজী ১৮৭৫ সালে বসু পরিবারে নামে শোকের ছায়া। জগদীশচন্দ্রের দশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যু হয়।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক ফাদার লেফণ্টের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সংস্পর্শে আসায় তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রবল হয়।

চার বছর পর ১৮৭৮ সালে কুড়ি বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পাশের পর তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। আরোগ্য লাভের পর তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য উৎসুক হন।

পিতা ভগবানচন্দ্র তখন সর্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে মোটা মাইনের সরকারী চাকুরি নিয়ে পিতাকে তাড়াতাড়ি ঋণমুক্ত করবার অভিলাষ ছিল জগদীশচন্দ্রের।

কিন্তু পিতা ভগবানচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। পুত্রকে বিজ্ঞান-শিক্ষা দেবার জন্য তিনি উৎসুক হন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা জগদীশচন্দ্র দেশহিতকর কল্যাণকর কার্য করতে সমর্থ হবেন। অর্থাভাব তখন ভগবানচন্দ্রের সঙ্কল্পের অন্তরায় ছিল—যেহেতু তিনি তখন ঋণগ্রস্ত।

আরও এক অন্তরায় ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল বিয়োগ-ব্যথায় জগদীশচন্দ্রের জননী তখন ম্রিয়মানা। একমাত্র পুত্রকে দূরদেশে পাঠাতে তিনি অসম্মতা হন।

দারুণ দুঃখ ও ব্যথায় কাতর তখন জগদীশচন্দ্র। রাতদিন তিনি রামায়ণ-মহাভারত পড়তেন। মহাকাব্য পাঠে তিনি মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতেন।

পুত্রের ম্লান মুখ জগদীশচন্দ্রের মাতার দৃষ্টিতে এড়াল না। কনিষ্ঠ পুত্রের শোক তিনি ভুললেন। চোখের জল মুছে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদীশচন্দ্রের বিলাত যাত্রায় অনুমতি দিলেন।

তবুও অন্তরায়! পিতা ঋণগ্রস্ত···অর্থহীন।

জগদীশচন্দ্রের জননী পুত্রের বিলাত যাত্রার জন্য অর্থ দিলেন। মায়ের অর্থে জগদীশচন্দ্র ডাক্তারি পড়বার জন্য চললেন বিলাতে।

॥ সাগরপারের শিক্ষা ॥

[১৮৮০—১৮৮৪]

জগদীশচন্দ্রের প্রথম সমুদ্র যাত্রা।

জাহাজেই হ'ল জ্বর। যাক্, শেষে নিরাপদে জগদীশচন্দ্র পৌঁছলেন ইংরাজদের খাস মাটিতে।

লণ্ডনে জগদীশচন্দ্র ডাক্তারি পড়তে সুরু করেন। পশ্চিম তোরণে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ-সাধককে জয়মাল্য নিয়ে আহ্বান করার জন্য অপেক্ষা করছেন বিজ্ঞান-লক্ষ্মী।

মেডিক্যাল কলেজে মরা কাটতে গিয়ে জগদীশচন্দ্রের জ্বর হ'ল। পিতার অনুমতি নিয়ে কেম্‌ব্রিজে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য জগদীশচন্দ্র ভর্তি হ'লেন।

সেদিন ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাস।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ অর্থাৎ পদার্থ বিদ্যা, রসয়ান বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা—এই তিনটিতে একসঙ্গে অনার্স কোর্স।

এ কোর্সে কেমব্রিজে ভর্তি হলেন জগদীশচন্দ্র।

কেমব্রিজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক মাইবেল ফষ্টর ভাইনস, ফ্রান্সিস ডারুইন ও লর্ড র‍্যালের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন জগদীশচন্দ্র। বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের সুপ্ত প্রতিভা দক্ষ অধ্যাপনার স্পর্শে উন্মেষ হয়।

চার বছর পর তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ পান এবং বৃত্তি লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন।

সাগর পারের শিক্ষা সমাপন করে জগদীশচন্দ্র ফিরলেন দেশে চার বছর পর।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা

[১৮৮৫—১৯১৫]

সাগরপারের শিক্ষা সমাপনের পর জগদীশচন্দ্র ফিরলেন দেশে। দেশে ফিরবার কিছুদিন পরই জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হয়।

বিবাহ হ'ল চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠতুতো বোন শ্রীমতী অবলার সাথে। অবলা তখন বি. এস-সি পাশ করে ডাক্তারি পড়ছিলেন।

ভারতবাসী বিজ্ঞান শিক্ষায় ও গবেষণায় অমনোযোগী ও অযোগ্য ইংরাজের এ অপবাদ জগদীশচন্দ্রকে ব্যথিত করল। বিজ্ঞান গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করবেন এই হল সেদিন জগদীশচন্দ্রের পণ।

গবেষণার পক্ষে শিক্ষাবিভাগের চাকুরি সহায়ক। সরকারের নিকট তিনি শিক্ষা-বিভাগের চাকুরি প্রার্থনা করলেন।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর চাকুরি হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ তিনি পেলেন। বেতন ইংরাজ অধ্যাপকদের দেয় বেতনের অর্ধেক।

স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্র মানলেন না এই বৈষম্য। যোগ্যতা যেখানে সমান, অনেক ক্ষেত্রে বেশীই—সেখানে এ বৈষম্য কেন? স্বদেশের মর্যাদার জন্য, আত্মসম্মানের জন্য তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি অর্ধ-বেতন প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইংরাজ প্রিন্সিপাল কিন্তু গুণগ্রাহী। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে জগদীশচন্দ্র যোগ্য বেতন পান। যতদিন তা না হয় ততদিন তিনি

মাসে মাসে পাঁচশ টাকা করে নিজের বেতন থেকে দিতে লাগলেন জগদীশচন্দ্রকে ধার স্বরূপ।

মাসান্তে একখানা করে চেক আসত জগদীশচন্দ্রের নামে। জগদীশচন্দ্র তা স্পর্শ করতেন না। বিনা-বেতনেই তিনি চালিয়ে যান অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ।

অবশেষে সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হল। তিন বছর বিনা-বেতনে চাকুরি করার পর জগদীশচন্দ্র পুরা বেতনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হলেন। একসঙ্গে তিনি পেলেন তিন বছরের পুরা বেতন।

ভারতীয় ও ইংরাজ অধ্যাপকদের বেতন বৈষম্যের অবসান হল। জগদীশচন্দ্রের তুঃখভোগের সংগ্রামে দেশের অমর্যাদাকর প্রথা উঠে গেল।

পিতা ভগবানচন্দ্রের স্কন্ধে তখন বিরাট ঋণের বোঝা। বাড়ির সম্পত্তি ও মায়ের সম্পত্তি বেঁচে এবং তিন বছরের পুরা বেতনের টাকায় পিতার ঋণ শোধ করলেন জগদীশচন্দ্র। ঋণমুক্ত হয়ে ১৮৮২ সালে পিতা ভগবানচন্দ্র মারা যান।

প্রেসিডেন্সি কলেজে এখন জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক ও গবেষক। অধ্যাপনার জন্য বেতন পান কিন্তু গবেষণা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। চার ঘণ্টা অধ্যাপনা আর দিনরাত তিনি ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন।

অতি সাধারণ ল্যাবরেটরি। পরীক্ষার কাজের জন্য ল্যাবরেটরিতে ভাল যন্ত্র ছিল না। দেশীয় কারিগর দিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী করিয়ে জগদীশচন্দ্র গবেষণার কাজ চালান।

প্রাচীন ভারতের আর্যঋষির মত জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা। ছাত্রদের কাছে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র নামে পরিচিত।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে তখন তাঁর গবেষণা চলছে। লণ্ডনের রয়্যাল-সোসাইটিতে তাঁর গবেষণা স্বীকৃতি পেল।

গবেষক জগদীশচন্দ্র পেলেন রয়্যাল-সোসাইটির বৃত্তি এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি উপাধি। ভারত সরকারও জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্য বাৎসরিক আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন।

১৮৯৫ সাল। জগদীশচন্দ্রের বয়স তখন সাঁইত্রিশ। জগদীশচন্দ্র **বেতার-যন্ত্র** আবিষ্কার করলেন। তার আগে আবিষ্কার করেছেন **অদৃশ্য আলোক।**

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-সভায় তাঁর আবিষ্কার সাড়া জাগায়।

সরকারী ব্যয়ে সওয়া এক বছরের ছুটিতে লণ্ডনের বৃটিশ-এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র সাগরপারে যাত্রা করলেন।

॥ দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা ॥

[১৮৯৬]

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক-গবেষণায় রত হন। দশ বৎসর কাল গবেষণার ফলে (১৮৮৫-১৮৯৫) তিনি বেতার-যন্ত্র এবং অদৃশ্য আলোক আবিষ্কার করলেন।

১৮৯৫ সালে যখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ, তখন তিনি তাঁর নিজ গবেষণাগারে নিজ হাতে তৈরি গ্রাহক ও প্রেরক-যন্ত্রসহ আজকালকার বেতারের মতই যন্ত্র বসান। এর সাহায্যে তিনি একস্থান থেকে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হন।

লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সমাজে গবেষণার পরীক্ষা দেখাতে না পারলে আবিষ্কারকের আবিষ্ক্রিয়া তখন স্বীকৃতি পেত না। বাঙালীর উদাসীনতায়, বিদেশী সরকারের অবহেলায় ও অর্থের অভাবে নিজের বেতার-যন্ত্রের পরীক্ষা ইউরোপে গিয়ে দেখাতে পারেননি জগদীশচন্দ্র সে দিন।

ইতিমধ্যে ইতালি থেকে লণ্ডনে গিয়ে মার্কনি নিজের বেতার-যন্ত্রের পরীক্ষা দেখালেন। যদিও মার্কনির যন্ত্র জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের পরে তৈরি হয় তবুও মার্কনি-ই পেলেন আবিষ্কারকের সম্মান।

তখন বিদ্যুতের যুগ। জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈদ্যুতিক গবেষণার বিবরণ লিখে পাঠান লণ্ডনের রয়্যাল-সোসাইটির কাছে। সোসাইটির কাগজে তা প্রকাশিত হয়।

গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্র সোসাইটির কাছ থেকে বৃত্তি পান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন (১৮৯৫)। দেখাদেখি ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ব্যয় বাবদ বছরে আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন।

জগদীশচন্দ্রের **'অদৃশ্য আলোক'** আবিষ্কারের কথা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুর মত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পদার্থ ঈথার। ঈথার তরঙ্গে ভেসে আসে আলো। আলোর রশ্মি পড়লে ঈথারে কম্পনের সৃষ্টি হয়। ঈথার তরঙ্গের স্পন্দন চক্ষুতে অনুভূত হয় যখন তখন আমাদের আলোক জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

আমাদের চক্ষু সাতটি রঙের আলো অনুভব করতে পারে। তার বাইরে যে আলো আছে তা আমাদের চক্ষু অনুভব করতে পারে না। এর নাম 'অদৃশ্য আলো'। দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ ও অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গকে পৃথকীকরণ জগদীশচন্দ্রের আগে কেউ করতে পারেননি।

'অদৃশ্য আলোক' সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার তখন ইউরোপে সাড়া এনেছে। লণ্ডনের বৃটিশ-এসোসিয়েশন জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন। সওয়া এক বছরের ছুটিতে সরকারী ব্যয়ে জগদীশচন্দ্র চললেন লণ্ডনে (১৮৯৬)।

লণ্ডনে পৌঁছে জগদীশচন্দ্র লিভারপুলে বৃটিশ-এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেন। বিলাতে 'চন্দ্র বসু' নামে তিনি অভিহিত হন।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইনস্টিটিউটের 'শুক্র-বাসরীয়' বক্তৃতা-সভায় তিনি তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা সহ বেতার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্র-সাহায্যে তিনি অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে বহুবার বক্তৃতা প্রদান করেন।

পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন মহলে জগদীশচন্দ্র প্রচুর সম্মান ও প্রশংসা লাভ করলেন। লণ্ডনের কোন কোন কোম্পানি লাভের অর্ধাংশের বিনিময়ে তাঁকে তাঁর আবিষ্কারের পেটেণ্ট দিতে এবং বেতার-যন্ত্রের কৌশল বিক্রি করতে অনুরোধ জানান।

বিজ্ঞান জগদীশচন্দ্রের সাধনা। তা নিয়ে অর্থকরী ব্যবসা করবার বাসনা তাঁর ছিল না। এমনই নির্লোভ ছিলেন জগদীশচন্দ্র।

॥ তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা ॥

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী—প্যারিস

[১৯০০]

প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হ'ল উনিশ শ' খৃষ্টাব্দের শেষভাগে। ভারত থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ও আচার্য জগদীশচন্দ্র। বিবেকানন্দের ধর্মসভায়, আর জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা দেবার কথা।

আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। সরকারী চাকরি। সরকারী অনুমতি ছাড়া কলেজের কাজ ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এবং ছোটলাট ছুটি দিলেন না—কলেজের অধ্যাপনার কাজের ক্ষতি হবে।

ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত। আন্তর্জাতিক পদার্থ বিষয়ক সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার এ নিমন্ত্রণ এনেছে তাঁর সামনে এক মহান সুযোগ। এ সুযোগ তিনি ত্যাগ করতে পারেন না।

বাধার উপর আর এক বাধা। আপনভোলা মানুষ জগদীশচন্দ্র—নিমন্ত্রণ-পত্র হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

সাধনা যখন ঐকান্তিক হয়, বাধা হয় তখন ধূলিসাৎ। জগদীশচন্দ্র প্রতিনিবৃত হলেন না। মাস তিনেকের আপ্রাণ চেষ্টার পর ভারত-সচিবের অনুমতি-পত্র এল জগদীশচন্দ্রের হাতে। সস্ত্রীক প্যারিস রওনা হলেন তিনি উনিশ শ' খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে।

উনিশ শ' খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে প্যারিস শহরে আন্তর্জাতিক পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়।

এই সম্মেলনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—**'চেতন ও অচেতনের মধ্যে অভিন্ন জীবন প্রবাহ'**।

জগদীশচন্দ্রের এ তত্ত্ব ইউরোপবাসিগণের কাছে সম্পূর্ণ নতুন, যদিও ভারতবাসিগণের কাছে এ তত্ত্ব মোটেই নতুন নয়। তিন হাজার বছর আগে ভারতের ঋষিগণ কল্পনায় উপলব্ধি করেন এ সত্য—প্রকৃতির সাথে প্রাণী জগতের সম্পর্কের কথা।

তিন হাজার বছর পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যা কল্পনায় উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদেরই বংশধর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র তা তিন হাজার বছর পরে প্রমাণ করলেন স্বহস্ত নির্মিত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা। প্রাচীন ভারতের অলিখিত বাণীকেই এই নবযুগে তিনি করলেন মূর্ত।

এই সত্যকে ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে জগদীচন্দ্র বসুকে বিষম বেগ পেতে হয়।

ইউরোপীয় উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের বিরোধী মত খণ্ডন করে সত্য-সন্ধানী জগদীশচন্দ্র নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এতদিনকার বিশ্বাস ছিল—চেতন ও অচেতনের মধ্যে জীবনপ্রবাহ ভিন্ন—জগদীশচন্দ্রের মতানুযায়ী এদের জীবন-প্রবাহের অভিন্নতা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। দু'একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মত আংশিক ভাবে স্বীকার করেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-জগতের পূর্ণ সমর্থন তিনি সেদিনও পাননি।

উদ্ভিদ্‌কে প্রাণহীন সাব্যস্ত করে আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-জগত নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। উদ্ভিদ্-জীবনের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে অগ্রসর হল না।

সেই অন্ধকারে একাকী দীপ হস্তে প্রবেশ করলেন ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবান জগদীশচন্দ্র। উদ্ভিদ্ জীবনের বিবিধ কঠিন সমস্যা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

উদ্ভিদ্ জীবনের গোপন রহস্য ভেদ করবার জন্য তিনি দেশীয় কারিগর দিয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী করান। এর পূর্বে উদ্ভিদ্ জীবন সম্পর্কে কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি।

প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয় ছিল—

জীব, জড় ও ধাতুর উপর
বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া অভিন্ন।

নিজ উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে বক্তৃতার দ্বারা এই সম্মেলনে বিদ্বজ্জনের সম্মুখে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন তাঁর মতবাদ।

বিরাট সাফল্য লাভ করলেন সেদিন জগদীশচন্দ্র। সার্থক হ'ল বিদেশে সেদিন ভারত-প্রতিভা।

প্যারিসের বিদ্বজ্জন সমাজে জগদীশচন্দ্রের এই অসমামান্য সাফল্য তাঁর কিংবা ভারতের গৌরবই নয় শুধু!

উদ্ভিদ্‌কে প্রাণহীন সাব্যস্ত করে পাশ্চাত্য জগত নিশ্চিন্ত ছিলেন। উদ্ভিদ-জীবনের গোপন রহস্য গোপনই ছিল।

জগদীশচন্দ্রের **চেতন** ও **অচেতনের** মধ্যে জীবন প্রবাহের অভিন্নতা প্রমাণের ফলে উদ্ভিদ্ জীবনের জয়যাত্রার পথ সূচিত হ'ল। গোপন রহস্যের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'ল। গাছের পাতায় লতায় নবজীবন জাগে। তৃণভূমিতে, শস্যক্ষেত্রে জীবন-প্রবাহ বয়ে যায়। সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হ'ল। আর্যঋষিগণের সুযোগ্য পুত্র জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় শুদ্ধ উপলব্ধি লাভ করল আধুনিক জগৎ।

॥ লণ্ডনে জগদীশচন্দ্র ॥

[১৯০১—আগষ্ট, ১৯০২]

প্যারিস থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন লণ্ডনে।

জগদীশচন্দ্রের নতুন বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের কথা লণ্ডনবাসী বৈজ্ঞানিক-গণের অবিদিত ছিল না। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব প্রচলিত তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী।

লণ্ডনে দু-একজন বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে আলোচনার জন্য আসেন জগদীশচন্দ্রের কাছে। নিজের উদ্‌ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁদের সামনে প্রমাণ করে দেখালেন যে তাঁর তত্ত্ব সত্যসত্যই সত্য।

কিছু কিছু ইউরোপীয়-বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মতের বিরুদ্ধতা শুরু করলেন।

জগদীশচন্দ্রের মত প্রচলিত মতের বিরোধী। জগদীশচন্দ্রের তথ্য গৃহীত হলে অন্যান্যদের মত অচল হবে। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিরোধিতার কারণ এই।

বিরোধীদলের ষড়যন্ত্রের মুখে জগদীশচন্দ্র অসীম ধৈর্য ও সাহসের সাথে তাঁর আবিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হলেন। একদিকে অর্থাভাব, অন্যদিকে অসুস্থ দেহ। তবুও জগদীশচন্দ্র বিরোধী দলের সহিত সংগ্রামে অটল ও অবিচলিত ছিলেন।

আদর্শ যখন মহান্, লক্ষ্য যখন স্পষ্ট, সংগ্রাম যখন ঐকান্তিক, জয় তখন অবশ্যম্ভাবী।

১৯০১ সনের ১০ই মে। লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিট্যুশনে লণ্ডনের বৈজ্ঞানিকদের সামনে নিজ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হলেন। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

জগদীশচন্দ্র এই সভায় প্রতিপন্ন করতে উদ্যোগী হলেন—জড় পদার্থ সম্পর্কে নিজ মত—**জড় পদার্থে জীবনের সাড়া**। বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক তাড়নার ফলে জড় পদার্থও সাড়া দেয়। এই হ'ল সেদিন জগদীশচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বক্তৃতার দ্বারা এবং তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-জগতে তাঁর আবিষ্কার স্বীকৃতি পেল।

ইউরোপে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের স্বীকৃতির সংবাদ বাঙালী তথা ভারতবাসীর প্রাণে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করল।

একদা আর্য ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় প্রদীপ্ত ভারত সেদিন দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রায় ভারতবাসীর প্রাণে বাংলার প্রতিভাবান সন্তান জগদীশচন্দ্র আপনার দুশ্চর সাধনার বলে সঞ্চারিত করলেন সেদিন নব আশার কল্লোল।

লণ্ডনে সেদিনকার সভায় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতা (Margaret Nobel) প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে আসেন স্বামী বিবেকানন্দের সাথে। বসু দম্পতীর সাথে

তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু। জগদীশচন্দ্রের এই বিজয়বার্তা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে নিবেদিতা লিখলেন ঃ

"শিষ্য ভাবে নহে, সমকক্ষ ভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক সভায় ভারত প্রমাণ করল জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠতা।"

লণ্ডনের পণ্ডিতগণও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তাঁদের অনুরোধে জগদীশচন্দ্র আরও কিছুদিন লণ্ডনে থেকে অধ্যাপনা ও গবেষণা করতে চান। কারণ গবেষণার তখন অনেক বাকী।

জার্মানী ও আমেরিকায় যাওয়াও দরকার।

এদিকে জগদীশচন্দ্রের ছুটিও ফুরিয়ে আসে। ছুটির জন্য আবেদন করলেন। ছুটি মঞ্জুর হ'ল না।

অর্ধবেতনে ছুটি চাইলেন জগদীশচন্দ্র। তাও মঞ্জুর হ'ল না।

এই অবস্থার মধ্যে জগদীশচন্দ্র অর্থ অভাবে পীড়িত হলেন। বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র পত্র দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন ঋণজালে জড়িত। নিজের টাকা ছিল না। তিনি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বাহাদুরের দ্বারস্থ হন।

রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বাহাদুর রবীন্দ্রনাথকে ১৫ হাজার টাকা দান করলেন। সেই টাকা তখনই তিনি জগদীশচন্দ্রকে পাঠান।

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার মহারাজার এই দান চিরস্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিজয়-গৌরবে তিনি উল্লসিত হন।

জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা ঘোষণায় কবির ছিল সীমাহীন উৎসাহ। কারণ কবি জানতেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতমাতার ম্লান মুখচ্ছবি উদ্ভাসিত হবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র অবিরাম বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতকে জ্ঞানোজ্জ্বল করবার আহ্বান জানিয়ে কবিতা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ ঃ

…ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম পূতাগ্নি ঘিরিয়া
আবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক সে অপ্রমত্ত চিত্তে।
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে॥

॥ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ॥

[শিলাইদহ]

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যখন পরিচয় হয় তখন জগদীশচন্দ্রের বয়স উনচাল্লশ এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স ছত্রিশ।

১৮৯৬ সাল। জগদীশচন্দ্র ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে **"অদৃশ্য আলোক"** সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা প্রকাশ করলেন। নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সেদিন **'বিদ্যুৎ-তরঙ্গ'** (ঈথার) উৎপাদন করে তাঁর অস্তিত্ব সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন। বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে ইউরোপে ইতিমধ্যে মার্কনি স্বীকৃতি লাভ করলেও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ বেতার সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দেখে অনুধাবন করলেন যে—বেতারে তারবার্তা প্রেরণের সম্ভাবনার কথা জগদীশচন্দ্রের মনেই প্রথম উদিত হয়।

প্রথম ইউরোপ যাত্রার অসামান্য সফলতার পর যখন তিনি দেশে ফিরিলেন তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের সাথে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় ঘটে এবং তখন থেকে উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সূচনা হয়। এই বন্ধুত্বের উদ্বোধন করলেন তিনি তাঁর লেখনী মারফত ১৮৯৭ সালের প্রারম্ভে।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন এক বিশ্বজয়ী প্রতিভা। কিন্তু সে প্রতিভার বিশ্বজয়ের পথে বাধা বিদেশী সরকারের উদাসীনতা এবং পরাধীন স্বদেশবাসিগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তার অভাব।

এই বিশ্বজয়ী প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে ঢেলে দিলেন হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ হলেন জগদীশচন্দ্রের সাহস ও প্রেরণা।

জগদীশচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল সীমাহীন শ্রদ্ধা ও প্রীতি, কারণ তিনি অনুধাবন করলেন জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনা— ব্যক্তিগত স্বার্থ-লাভের জন্য নয় পরন্তু তাহা দেশ ও জাতির জন্য। পুরাতম আর্যঋষিগণের জ্ঞানালোক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে প্রত্যক্ষ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাই তিনি জগদীশচন্দ্রকে নিবেদন করলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ জশদীশচন্দ্রকে করলেন আহ্বান ঃ

ভারতের কোন বৃদ্ধ তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য, আচার্য জগদীশ।

ভারতবাসীরা নাকি কোনদিন বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী হতে চান না। পাশ্চাত্য জাতির এ অপবাদ জগদীশচন্দ্রের কাছে ছিল অসহনীয়।

জগদীশচন্দ্র তাই অসীম দুঃখ ও দৈন্য মাথায় নিয়ে সর্বস্ব পণ করে বিজ্ঞানচর্চায় আমরণ ব্রতী হন। স্বদেশের প্রতি তার এই অনুরাগ স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। জগদীশচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রীতির মূলে ছিল এই দেশাত্মবোধ।

তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মানসিক চেতনাবোধের সাথে জগদীশচন্দ্রের মানসিক চেতনাবোধের ছিল অপূর্ব মিল।

দু'জনারই প্রতিভা ছিল বিশ্বজয়ী। প্রকৃতির সাথে দু'জনারই ছিল অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক। দু'জনারই ছিল সমান শিল্পবোধ ও রসানুভূতি। পার্থক্য শুধু এই যে রবীন্দ্রনাথ কবি, জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী।

জগদীশচন্দ্র যদিও বৈজ্ঞানিক, তাঁর ছিল রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিক ও কবি মন। তিনি নিজেও অনেক কিছু লিখেছেন— যেমন "অব্যক্ত" (প্রকাশ ১৯২১), উদ্ভিদের সাড়া, জড় ও প্রাণী-জগতে স্পন্দন প্রভৃতি বই এবং নানান প্রবন্ধ।

জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধ "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" তাঁর অমর গ্রন্থ "অব্যক্ত"-এর একটি অংশ। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে প্রবন্ধটি জগদীশচন্দ্র রচনা করেন।

"প্রবাসী" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "প্রবাসী" পত্রিকায় ১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

মাসিক পত্রে ইহাই জগদীশচন্দ্রের প্রথম রচনা। জগদীশচন্দ্রের রচনা বৈজ্ঞানিক আলোচনা হলেও তার মধ্যে ছিল সাহিত্য রস।

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ছিল জগদীশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। দ্বিতীয়বার বিলাতে থাকা কালে জগদীশচন্দ্র যখন জড় জীবনের সাড়া প্রমাণ করছিলেন তখনই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্প ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং বিলাতের কাগজে প্রকাশ করেন।

১৯০২ সনের আগস্ট মাসের শেষাশেষি জগদীশচন্দ্র দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা সমাপন করে দেশে ফিরলেন। দেশবাসী জানালেন তাঁকে সম্বর্ধনা।

রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মার তীরে শিলাইদহের বাস-ভবনে। সেখান থেকে সম্বর্ধনা-সঙ্গীত তিনি পাঠালেন সম্বর্ধনা-সভায় আর জগদীশচন্দ্রকে শিলাইদহে জানালেন আমন্ত্রণ।

শিলাইদহে গেলেন জগদীশচন্দ্র। যে কয়েকটি দিন জগদীশচন্দ্র শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাথে ছিলেন সে কয়টা দিন কবির সাথে সাহিত্য-চর্চায় তাঁর দিন কাটে। জগদীশচন্দ্রের ফরমাসে রবীন্দ্রনাথ দিনের বেলায় একটি করে গল্প লিখতেন এবং রাত্রে জগদীশচন্দ্রকে পড়ে

শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি। এই গল্পগুলোর কয়েকটার রচনার মূলে ছিল জগদীশচন্দ্রের ফরমাস।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'খেয়া' (প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯০৬), 'কথা' কাব্য বন্ধুবর জগদীকে উৎসর্গ করেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা সাগর পারে পরিচিত কররার জন্য সচেষ্ট হন জগদীশচন্দ্র। আর জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনা স্বদেশে পরিচিত করার জন্য সচেষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গদর্শনে নিয়মিতভাবে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার বিবরণ লিখতেন।

স্বদেশবাসিগণের অনুপ্রেরণা দূর সিন্ধু পারে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান যাত্রা পথকে সুখকর করেছিল।

॥ নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র ॥

[১৯০১—১৩ অক্টোবর, ১৯১১]

নিবেদিতার পূর্ব নাম মিস্ মার্গারেট নোবেল (**Miss Margaret Noble**) ইনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রধানা শিষ্যা। গুরুর আহ্বানে তিনি ভারতে আসেন। ভারতবর্ষের প্রতি ছিল তাঁর নিবিড় অনুরাগ। ভারতের মঙ্গল ছিল তাঁর অন্তরের একান্ত কামনা। ভারতবর্ষের সেবায় তিনি দেহ ও মন সমর্পন করেন।

বিজ্ঞানের সাধনায় সেদিন জগদীশচন্দ্র নানা প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করেছেন একাকী। ভারতের এই সহায়-সম্বলহীন অথচ অতুল সম্ভাবনাময় এই বিজ্ঞান-সাধককে সহায়তা করবার জন্য এগিয়ে গেলেন নিবেদিতা। ১৮৯৮ সাল থেকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন।

ভারতের প্রতি নিবেদিতার ছিল নিবিড় অনুরাগ। জগদীশচন্দ্র তাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

বিজ্ঞান-সাধনায় জগদীশচন্দ্র ছিলেন আপনভোলা-মানুষ। জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাই ছিল নিবেদিতার অপরিসীম সহানুভূতি। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ ও জড় যে প্রাণবন্ত তা প্রমাণের জন্য বাড়ির ল্যাবরেটরিতে দিনরাত গবেষণায় রত। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়ে তাঁর কাজে সহায়তা করতেন নিবেদিতা।

জগদীশচন্দ্র নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে নিবেদিতা স্নেহময়ী ভগিনীর মত তাঁকে উৎসাহ দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ বাইরে জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী গবেষণার কাহিনী নিজ রচনার মাধ্যমে জনসমাজে পরিচিত করান। আর ঘরে নিবেদিতা সহানুভূতি ও কাজ দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান-সাধনায় রত রাখেন। বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় একদিকে যেমন ছিলেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে তেমন ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। দু'জনার দানই অসামান্য।

প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় উনিশশো খৃষ্টাব্দের শেষভাগে। ভারত থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র। বিবেকানন্দ ধর্মসভায় এবং জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সভায় বক্তৃতা দেন।

উনিশশো খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য জগদীশচন্দ্র স্ত্রী অবলা বসুর সাথে প্যারিস যাত্রা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সাথে যান ভগিনী নিবেদিতা। প্যারিস থেকে জগদীশচন্দ্র যান লণ্ডনে। বসু-দম্পতীর সঙ্গিনী হন নিবেদিতা।

প্যারিসের আন্তর্জাতিক মেলায় এবং লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিট্যুশনে পরীক্ষা ও বক্তৃতা দ্বারা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন যে উদ্ভিদ এবং

জড় ও প্রাণবন্ত। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃতি পায়।

ভারতের সেদিন শুভদিন। সেই শুভদিনে ভারতানুরাগিনী নিবেদিতা ভারতের বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের সাথে লণ্ডনে ছিলেন।

সেই শুভবার্তা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিতা লিখলেন :

"শিষ্য ভাবে নহে, সমকক্ষ ভাবেও নহে, গুরু ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় ভারত প্রমাণ করল জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠতা।"

ইউরোপ থেকে জয়মাল্য নিয়ে পত্নী অবলাও ভগিনী নিবেদিতার সাথে দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র শিলাইদহ থেকে পেলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ। সেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথের অনাবিল বন্ধুত্ব হ'ল জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের অমূল্য সম্পদ।

ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলোর প্রতি জগদীশচন্দ্রের ছিল বিশেষ ভক্তি। সময় ও সুযোগ মত তিনি তীর্থ ভ্রমণে বার হতেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জগদীশচন্দ্র তীর্থভ্রমণে বুদ্ধগয়ায় যান সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা ও অবলা বসু।

বুদ্ধ গয়ায় বোধি-বৃক্ষের কাছে একখানা গোলাকার পাথরের উপর একটি বজ্রচিহ্ন নিবেদিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগদীশচন্দ্র সেই পাথরটা বাড়িতে নিয়ে আসেন। '**বসু বিজ্ঞান মন্দির**'-এর শীর্ষে তাহা আজও রক্ষিত আছে।

১৯০৫ সাল। এপ্রিল মাস। টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত নিবেদিতা। বাগবাজারের বাসা থেকে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে আনালেন সারকুলার রোডে একটি ভাল বাড়িতে। ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আরোগ্য-লাভের পর তিনি বসু-দম্পতীর সাথে যান দার্জিলিং-এ।

তারপর তৃতীয়বারের জন্য জগদীশচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন। লণ্ডন ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯০৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত।

১৯১০ সালের গ্রীষ্মাবকাশ। আবার তীর্থযাত্রা। এবার কেদার বদরী। সঙ্গে অবলা বসু ও নিবেদিতা।

১৯১১ সালে জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির পদে আমন্ত্রিত হন কিন্তু এক দুঃসংবাদ তাকে শোকাহত করল।

১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর। দার্জিলিং-এ জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে নিবেদিতার মৃত্যু হয়।

অবসাদে উদ্দীপনা, শ্রান্তিতে ভরসা নিবেদিতা। ভগিনী...... সত্যকারের ভগিনী নিবেদিতা। অসময়ে জগদীশচন্দ্র হলেন ভগিনী-হারা।

॥ চতুর্থ সমুদ্রযাত্রা ॥

আমেরিকায়

[সেপ্টেম্বর ১৯০৭—আগষ্ট ১৯০৯]

আমেরিকায় তখন স্বামী বিবেকানন্দের নাম মানুষের মুখে মুখে। অগণিত মার্কিন তরুণ-তরুণী তাঁর ভক্ত ও শিষ্য। স্বর্গীয় স্বামীজি ও তাঁর শিষ্যগণের তৈরি বেদান্ত-পাঠের কেন্দ্র আমেরিকার নগরে নগরে। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-ধর্ম ও আদর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন আমেরিকার নরনারী।

সাগর পারে বিবেকানন্দের নাম বাঙালী তথা ভারতবাসীদের প্রতিভা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ছিল অনুকূল। ইংলণ্ড ঘুরে জগদীশচন্দ্র যখন আমেরিকায় পৌঁছলেন তখন তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক-তথ্য

সর্বত্র সমাদরে গৃহীত হয়। বেতার উদ্ভাবন, অদৃশ্য আলোক ও বিদ্যুৎ তরঙ্গ আবিস্ক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও জড় প্রাণের সাড়া সম্পর্কীয় গবেষণা এবং তাঁর উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি সকলের মনে আনন্দ ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিদেশের পণ্ডিত-সভায় জগদীশচন্দ্র সাধুবাদ পান।

আমেরিকায় এসে জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিবেকানন্দের ধনী-শিষ্যা ওলিবুলের গৃহে। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় ধীরামাতা। ধীরামাতার অর্থে বিবেকানন্দের পরিকল্পিত রামকৃষ্ণ-সংঘের কেন্দ্র বেলুড় মঠ তৈরির কাজ শুরু হয়। নিবেদিতার মত ধীরামাতারও ছিল ভারতানুরাগ। ভারত-সন্তান বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সাধনার প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

ভারতে তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অভাব। এ নিয়ে জগদীশচন্দ্রের আক্ষেপের অন্ত ছিল না। এ আক্ষেপ ধীরামাতার অন্তরকে স্পর্শ করে। যে বছর নিবেদিতা মারা যান সেই বছর মারা যান ধীরামাতা।

ধীরামাতা জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের জন্য তিন হাজার ডলার দান করেন। তাঁর সেই সহৃদয় দানের চিহ্ন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। যাহা সাগর পারে আজ 'বোস্ ইনষ্টিট্যুট' নামে খ্যাত।

'বসু বিজ্ঞান মন্দির' স্থাপিত হয় ইংরাজী ১৯১৭ সালে। ধীরামাতার মৃত্যুর ছ' বছর পরে।

'সায়েন্স কলেজের পাশে এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের (পুরাতন আপার সারকুলার রোড) উপর এর অবস্থিতি। বিজ্ঞান-চর্চার পৃথিবী-খ্যাত কেন্দ্র আজ **'বসু বিজ্ঞান মন্দির'**।

॥ পঞ্চম সমুদ্রযাত্রা : ইউরোপ ও আমেরিকা ॥
[১৯১৪—১৯১৫]

প্রতিভা ব্যর্থ হয় না কোনদিন। স্বদেশে স্বীকৃত হ'ল জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

১৯১১ সাল। দিল্লী দরবার উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্র ভারত সরকারের কাছ থেকে পেলেন সি-আই-ই উপাধি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিলেন তাঁকে ডি-এস-সি উপাধি। ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে তাঁর আবিষ্কার পণ্ডিত সমাজে প্রচার করবার সুযোগও দিলেন। সরকারী ব্যয়ে ও সরকারি ছুটিতে তিনি পৃথিবী পর্যটনে যাবার অনুমতি পেলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র বার হলেন বৈজ্ঞানিক অভিযানে। এবার পঞ্চম সমুদ্রযাত্রা—ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ।

রবীন্দ্রনাথের তখন জগৎ জোড়া নাম। কবি রবীন্দ্রনাথ এখন তাঁর কবিতার বই "গীতাঞ্জলি" ইংরাজীতে অনুবাদ করালেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"র অনুবাদ প্রকাশ করল। পর বৎসর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ "গীতাঞ্জলি"র জন্য সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' পেলেন।

ভারতবাসী শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন। বন্ধুর অভিনন্দনে সকলের আগে ছিলেন জগদীশচন্দ্র। সম্বর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের তখন জগৎ-জোড়া নাম। কবি রবীন্দ্রনাথ এখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক অভিযানে বার হলেন। এবার পঞ্চম সমুদ্রযাত্রা!—ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ।

জগদীশচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান জগতে উদ্ভিদ সম্পর্কে আরও নতুন নতুন নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করবার জন্য

অগ্রসর হ'লেন। উদ্ভিদ জীবনের কত না রহস্য সে সব! মানুষের চোখে সে সব ছিল এতদিন অস্পষ্ট। নিজের উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি ভারতের গাছপালা দিয়ে জগদীশচন্দ্র সেইসব রহস্য উদঘাটিত করলেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় প্রদর্শনী-পরীক্ষার জন্য জগদীশচন্দ্রকে করতে হত কত না আয়োজন,···কত না শ্রম! প্রদর্শনী পরীক্ষার যন্ত্রপাতিগুলো অতিশয় সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য বিশেষ সতর্কতা দরকার। এসব পরিবহনে অপরের উপর নির্ভর করা চলত না। জগদীশচন্দ্র নিজেই যন্ত্রপাতিগুলো পরিবহন করতেন। তারপর পরীক্ষার জন্য রক্ষিত গাছপালা—গ্রীষ্মদেশের গাছপালার জন্য বিশেষ-ভাবে তৈরি কাচের ঘরে জগদীশচন্দ্র গাছপালা নিয়ে যান সাগরপারে। সাগরপারের দেশ শীতের দেশ। শীতের দেশে আবার গাছপালা রাখতে হ'ত বিশেষ আধারে।

বিজ্ঞানসাধনার পথ দুঃখ ও কষ্টের পথ। বিশেষতঃ ভারতের সন্তান জগদীশচন্দ্রের পক্ষে এই বিদেশে ইহা হয়ে উঠল বিষম সঙ্কটের পথ। এই পথে পাড়ি দিচ্ছেন সেদিন জগদীশচন্দ্র। পাশ্চাত্য দেশে কোন বিদ্বান ব্যক্তি বিনা প্রতিবাদে কোন তত্ত্ব-কথা গ্রহণ করেন না।

উদ্ভিদের জীবন প্রমাণ করতে জগদীশচন্দ্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণের প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়।

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনায় ছিলেন দৃঢ়চিত্ত এবং একনিষ্ঠ। ভারতের সম্মান রক্ষা তাঁর জীবনের মন্ত্র। সমস্ত বাধা বিপত্তি চূর্ণ করে বক্তৃতা ও পরীক্ষা দ্বারা তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতবাদ—**জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মতই সজীব**।

ভারতমাতার আশীর্বাদে প্রতিপক্ষরা পরাজয় স্বীকার করেন এবং জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মতবাদে বিশ্বাসী হন। সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব ঃ

জড় ও উদ্ভিদ সজীব! সফল হ'ল সেদিন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা।

লণ্ডনে "মৈডাভেল" নামক স্থানে তিনি নিজস্ব একটি সাময়িক পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। লণ্ডনে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রয়্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনে তিনি প্রচার ও প্রদর্শন করেন তাঁর আবিষ্কার।

লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন প্যারিসে, ভিয়েনায়, বার্লিনে। সর্বত্র তিনি পেলেন সাদর সম্বর্ধনা। ভিয়েনার রয়্যাল ইউনিভার্সিটির শরীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মোলিশের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইতিমধ্যে শুরু হ'ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯)। জগদীশচন্দ্র এলেন আমেরিকায়। এবার আমেরিকায় তিনি প্রচুর সম্বর্ধনা আর সাদর আমন্ত্রণ পান। কয়েক সপ্তাহ আমেরিকায় কাটিয়ে তিনি জাপান হয়ে ফিরলেন ভারতে।

জাপানে জগদীশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত বিখ্যাত মনীষী ও শিল্পী কাকুজো ওকাকুরার গৃহে অবস্থান করেন। ওকাকুরা স্বামী বিবেকানন্দের সাথে ভারতে আসেন এবং বিবেকানন্দের মৃত্যু পর্যন্ত এই দেশে ছিলেন। ওকাকুরা অখণ্ড এশিয়ার আদর্শে ছিলেন বিশ্বাসী আর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

১৯১৫ সালের জুন মাস। জাপান হয়ে ভারতে ফিরলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

॥ যশের মুকুট ॥

পাশ্চাত্য জগতে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা হ'ল স্বীকৃত। যশের মুকুট-শিরে তিনি হ'লেন পৃথিবী-খ্যাত।

প্রেসিডেন্সি কলেজ জগদীশচন্দ্রকে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর (১৯১৫) অধ্যাপনা থেকে অবসর দিল। কলেজের সাথে তাঁর সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হ'ল না। কলেজের সম্মানীয় অবৈতনিক অধ্যাপক রূপে তিনি গণ্য হন।

গবেষণার জন্য কলেজের গবেষণাগার ইচ্ছামত ব্যবহার করবার ক্ষমতাও তিনি পেলেন। গবেষণাকার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার পক্ষ থেকে বাৎসরিক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হ'ল। নির্বিঘ্নে গবেষণায় তিনি রত হন।...

১৯১৫ সনের কথা। সেই বৎসর জগদীশচন্দ্র পান লিডল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যর্থনা আর এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল-ডি উপাধি।

১৯১৭ সন। ভারত সরকারের নিকট থেকে তিনি পান এ বছর "নাইট" উপাধি।

১৯২০ সন। জগদীশচন্দ্র হলেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। মাদ্রাজের যশস্বী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত রামানুজম্ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এফ. আর. এস. অর্থাৎ ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি হন। ভারতের দ্বিতীয় এফ. আর. এস. হলেন বাংলার জগদীশচন্দ্র।

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি বিশ্ববিখাত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি না পেলে কোন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর পণ্ডিত মহলে সমাদর পান না। এখানকার এফ. আর. এস. হবার অনেক আগে জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক গবেষণার বিবরণ লিখে পাঠান লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে।

রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর পণ্ডিত মহলে জগদীশচন্দ্রের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

সোসাইটির পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়। লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস. সি উপাধিতে বিভূষিত করেন (১৮৯৫)। সেদিন থেকে তিনি ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু। এর আগে থেকেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.; কেমব্রিজের ট্রাইপোজ এবং লণ্ডনের বি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

আর এখন তিনি—ডঃ স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, কে. টি. সি. আই. এফ. আর. এস।

॥ ষষ্ঠ সমুদ্রযাত্রা ॥

১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে আমন্ত্রিত হন। এই তাঁর ষষ্ঠ সমুদ্রযাত্রা। এর পর আর তিনি যাননি দেশের বাইরে কোথাও। ১৯৩৮ সালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আমরণ এই দশটি বৎসর স্বদেশেই ছিলেন জগদীশচন্দ্র।

ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্রের সত্তর বছর বয়সের পূর্তি উৎসব হয়।

১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জগদীশচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, অনুরাগী ভক্তগণ ও ছাত্রবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্রকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিবেদন করেন।

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠিয়ে জানালেন অভিনন্দন। ভিয়েনার অধ্যাপক মোলিশ, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ জগদীশচন্দ্রকে শুভেচ্ছা জানালেন।

অনুষ্ঠানের শেষে একটি নারিকেল থেকে জাত দুটি চারা অধ্যাপক মোলিশ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে রোপণ করলেন। ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতিগত ঐক্যের প্রতীক।

বিশ্বভারতী, বৃহত্তর ভারত-সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরীতে অনুরূপ অনুষ্ঠান ঘটে।

আড়াই বছর পর। ১৯৩১ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার টাউন হলে জগদীশচন্দ্রকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার জন্য এক মহতী সভার আয়োজন হয়। কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র তখন সুভাষচন্দ্র। তিনিই মানপত্র পাঠ করেন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস ও জগদীশচন্দ্রের আশিতম জন্মতিথি পালনের আয়োজন হচ্ছিল বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে।

১৯৩৭ সনের কথা। জগদীশচন্দ্র তখন গিরিডির বাসভবনে। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য কলিকাতায় ফিরবার আয়োজন করছেন—এমন সময় ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ মঙ্গলবার সকাল সওয়া আটটায় বাথরুমে জগদীশচন্দ্র হঠাৎ মারা যান।

যশের মুকুট শিরে জগদীশচন্দ্র চলে গেলেন পরপারে।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের আখ্যা দিয়েছিলেন "আচার্য"।

সেই আখ্যাই জগদীশচন্দ্রের যোগ্য পরিচয়। জগদীশচন্দ্র আমাদের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র।

॥ বসু বিজ্ঞান-মন্দির ॥
[১৯১৭]

বসু বিজ্ঞান-মন্দির (বোস ইনষ্টিট্যুট) জগদীশচন্দ্রের অমর কীর্তি।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির বিজ্ঞান-অনুশীলনের পৃথিবী-খ্যাত একটি কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এখানে বিজ্ঞানচর্চার জন্য আসেন। জগদীশ-চন্দ্রের পরিকল্পনায় ও প্রচেষ্টায় এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৭ সাল—৩০শে নভেম্বর। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ষষ্ঠীতম জন্মদিবস। এই দিন প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির'।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে (পুরাতন আপার সারকুলার রোড)-র উপর বিজ্ঞান কলেজের পাশে বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপিত। ঈষৎ রক্তাভ বেলে পাথরে ভারতীয় আদর্শে নির্মিত অট্টালিকাভবন।

বিজ্ঞান মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রথমে পড়ে ছোট্ট একটি বাগান। বাগানে গাছপালা, সূর্যঘড়ি, উদ্ভিদের সাড়াজ্ঞাপক যন্ত্র। সম্মুখে হল। হল ঘরে কাচের আবরণীতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি। মনোহর হল ঘর—লোক ধরে দেড় হাজার। দেওয়ালে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা রূপক চিত্র। তন্মধ্যে একখানা ছবির নাম—বুদ্ধি ও কল্পনা। জগদীশচন্দ্রের ভাব। ভাবার্থ :—জ্ঞানরাজ্যে বুদ্ধি ও কল্পনা উভয়েরই দরকার। রূপদান করেছেন শিল্পাচার্য নন্দলাল। এর সাথে হল ঘরের ভিতরের ছাদ অজন্তার গুহাচিত্রের অনুকরণে চিত্রিত।

বক্তৃতামঞ্চ। উপরের ধাতুফলকে আঁকা চিত্র। ভাবার্থ :—আলোর আবির্ভাবে আঁধারের পরাজয়।

বিলাতের ন্যায় ভারতবর্ষে গবেষণাগার ছিল না। বৈজ্ঞানিক সাধনায় ভারতবাসীর বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এর কারণ বিদেশী

সরকারের অবহেলা। দু' একজন মনীষীর আজীবন প্রচেষ্টায় ভারতে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন সম্ভব হয়েছে। গবেষণাগারের অভাব ছিল ভারতে।

ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার ও গবেষণার জন্য কলকাতায় বৌবাজারের মোড়ে "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতের মধ্যে ইহাই প্রথম গবেষণাগার। তারপর উল্লেখযোগ্য জগদীশচন্দ্রের হাতে তৈরী 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির'।

১৮৯৬ সালে লণ্ডনের ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সওয়া এক বছরের ছুটি পেয়ে সরকারী ব্যয়ে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক বিলাতে যান। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত অদৃশ্য আলোক, ঈথার-তরঙ্গ, বেতার, জড় ও উদ্ভিদ জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা দেখান ইউরোপে।

সর্বত্র বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর পরীক্ষা দেখে ও বক্তৃতা শুনে তাঁর প্রশংসা করলেন।

ইউরোপ থেকে ফেরার পর আরও নিবিড় ভাবে বিজ্ঞান-সাধনায় নিযুক্ত হ'তে গিয়ে জগদীশচন্দ্র একটি পূর্ণায়তন গবেষণাগারের অভাব অনুভব করলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছোট গবেষণাগার' তাঁর কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে একটি পূর্ণায়তন গবেষণাগারের জন্য জগদীশচন্দ্র সরকারের নিকট লেখালেখি করলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

বিদেশী সরকার জগদীশচন্দ্রের প্রার্থনা উপেক্ষা করলেন।

লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিট্যুটের মত ভারতে পূর্ণায়তন একটি গবেষণাগার স্থাপনার সঙ্কল্প সেদিন থেকে স্থান পেল জগদীশচন্দ্রের মনে।

বিদেশী সরকারের উপর তিনি আর ভরসা রাখতে পারলেন না। নিজের চেষ্টায় সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হ'লেন।

১৯০৭-১৯০৯ সালের চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার সময় জগদীশচন্দ্র যখন আমেরিকায় আসেন তখন তিনি আমেরিকার ধনাঢ্যা মহিলা মিসেস্ ওলিবুলের গৃহে অতিথি হন।

ওলিবুল স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় ধীরামাতা। ধীরামাতার অর্থে বিবেকানন্দের পরিকল্পিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্র 'বেলুড় মঠ' তৈরীর কাজ শুরু হয়।

নিবেদিতার মত ধীরামাতারও ছিল ভারতানুরাগ। ভারত সন্তান জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হন। জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের জন্য তিনি তিন হাজার ডলার দান করেন। আরও অনেকে জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পিত গবেষণাগারের জন্য অর্থ দান করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা দানবীর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দু'লক্ষ টাকা দান করেন। গুজরাটের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মুলরাজ খাটাও দান করেন সওয়া দু' লক্ষ টাকা, আর বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ধনপতি পার্শি এস. আর. রোমানজী দান করেন এক লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জগদীশচন্দ্রের সঞ্চিত পাঁচ লক্ষ টাকা।

'বিজ্ঞান-মন্দির' ওলিবুল আর অন্যান্য দানবীরদের দানের স্মৃতিচিহ্ন। শীর্ষে 'বজ্রচিহ্ন' নিবেদিতার সংগ্রহ। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের অনুপ্রেরণা। তাঁরই স্মৃতি "নিবেদিতা সরোবর।"

'নিবেদিতা সরোবর' বিজ্ঞান মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের বাসভবনের মধ্যে অবস্থিত। ব্রোঞ্জের কাঠামোর মাঝখানে প্রদীপ হাতে দণ্ডায়মানা মহিলা মূর্তি। সামনে অর্ধচন্দ্রাকার জলাশয়। জলাশয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত।

তারপরে বীক্ষণাগার ও উদ্যান। সবুজ ঘাসে ঢাকা ছোট প্রান্তর। কুঞ্জ, ঝর্ণা ও জলাশয়ে রমণীয় উদ্যান। মাঝে মাঝে বসানো বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র।

বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্য—নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার এবং তাহা দেশ-দেশান্তরে প্রচার। এই প্রচারকার্যের ভার বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত পত্রিকার উপর, আর হলের বক্তৃতামঞ্চে দেশ-দেশান্তর থেকে সমবেত নরনারীর সম্মুখে বক্তৃতা ও পরীক্ষা দ্বারা নতুন তত্ত্ব প্রচারের হ'ল ব্যবস্থা। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে বিজ্ঞান-সাধনার এই ব্যবস্থা প্রচলিত। জগদীশচন্দ্র অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন ভারতে। এই হ'ল 'বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে'র স্বরূপ।

যুগে যুগে ভারত দেশদেশান্তরে ছড়িয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। ...আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে হয়ে যায় নিঃস্ব।...আবার যখন ফিরে আসে সামর্থ তখন আবার করে দানের হস্ত প্রসারিত।

প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের এসেছে আজ সেইদিন—এক নতুন যুগ। এই নবীন যুগের ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার পীঠস্থল—বসু বিজ্ঞান মন্দির। এইরূপ সার্বভৌমিক বিজ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান প্রচার ব্রতে প্রয়োজন ত্যাগ ও আত্মদান। ভারতের ইতিকথায় এই ত্যাগের আদর্শ মহারাজা অশোক—এই আত্মদানের আদর্শ মহামুনি দধীচি।

মানুষের দুঃখ বিমোচনের জন্য সর্বস্ব বিতরণ করে মহারাজা অশোক সম্বল করেন শুধু মাত্র অর্ধ আমলক। অসুররূপী অমঙ্গল বিনাশের উদ্দেশ্যে বজ্র নির্মাণের জন্য দান করেন দধীচি আপন অস্থি। ভারতের সার্বভৌমিক বিজ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান প্রচার ব্রতের মূলশক্তি ত্যাগ ও আত্মদানের প্রতীক আমলক ও বজ্র। নবীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার পীঠস্থল বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের গাত্রে তাই গ্রথিত আমলক, শীর্ষে তাই বজ্রচিহ্ন লাঞ্ছিত পতাকা—ত্যাগ ও আত্মদানের প্রতীক!

১৯১৭ সাল—৩০শে নভেম্বর। জগদীশচন্দ্রের ষষ্ঠীতম জন্মদিবস। এইদিন প্রতিষ্ঠিত হ'ল **বসু বিজ্ঞান-মন্দির**। নবীন ভারতের তক্ষশীলা।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় তখন।

সুদূর প্রবাস থেকে ছন্দ ও ভাষায় কবি জানালেন এ শুভলগ্নের আবাহন ঃ

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে
করো মহোজ্জ্বল আজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!

ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ হে।
শুভশঙ্খ বাজহ বাজ হে!

॥ জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন ॥

[জেনেভা—১৯২৮]

১৯২৮ সন। জেনেভার জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য জগদীশচন্দ্রের কাছে এল আমন্ত্রণ।

এবার জগদীশচন্দ্রের ইউরোপ যাত্রা—ষষ্ঠ যাত্রা। ইহাই তাঁর শেষ যাত্রা। এবারকার ইউরোপ ভ্রমণে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্‌রূপে পরিগণিত হলেন। এবার পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনের কাছে তিনি বিপুল সম্বর্ধনা পান।

ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশন, রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন, সোসাইটি অব আর্টস ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশ-চন্দ্রের এল আমন্ত্রণ। সর্বত্র সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে তিনি অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ করলেন—উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাণক্রিয়া সহধর্মী।

বেলজিয়ামের সম্রাটের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র বেলজিয়ামে যান।

সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রাণিতত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দান করেন।

জেনেভায় 'বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগদান করেন আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মিলনীতে। এখানেও সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে তিনি অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলেন—উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাণক্রিয়া সহধর্মী।

বিশ্ববরেণ্য জগদীশচন্দ্র মিশর হয়ে ভারতে ফিরলেন।

তাঁর প্রাণিতত্ব সম্বন্ধে আবিষ্কার সারা ইউরোপে আনল মহা আলোড়ন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ একবাক্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারকের প্রাপ্য সম্মান দান করলেন। জেনেভায় আন্তর্জাতিক বিদ্যামন্দিরের মঁসিয়ে লুসার বললেন—উদ্ভিদের প্রাণ সম্পর্কে ডঃ জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার এক অপূর্ব যুগান্তকারী আবিক্রিয়া।

বিশ্ববিখ্যাত লেখক রোমা রোলাঁ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তফাঁ" জগদীশচন্দ্রকে দান করেন। দান করবার সময় তিনি লিখলেন—

একটি নতুন জগতের আবিষ্কারককে।

পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বললেন—ডঃ বসু পৃথিবীকে কয়েকটি অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন উপহার। তাঁর যে কোন একটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা কর্তব্য।

পৃথিবীর সর্বত্র সেদিন স্বীকৃত হল বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্রের আবিক্রিয়া। ভারতের যুগান্তকারী অবদান।

॥ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ।

বেতার [১৮৯৫]

তারহীন বার্তাবহের উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র। ১৮৯৯ সালে যখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ তখন তাঁর নিজ গবেষণাগারে নিজ-হাতে তৈরি গ্রাহক ও প্রেরক-যন্ত্রসহ আজকালকার বেতারের মতই যন্ত্র বসান। এর সাহায্যে তিনি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ-প্রেরণে সমর্থ হন। ১৮৯৫ সালের শেষাশেষি সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়িতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সামনে তিনি বেতার সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা দেখালেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ রুদ্ধদ্বার পার হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ছুড়ল পিস্তল।

পৃথিবীতে বিনা-তারে শক্তি প্রেরণের প্রথম সূচনা এই দিন। আর একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ছোট লাট ম্যাকেঞ্জির সামনে তিনি দেখালেন এই পরীক্ষা।

লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সমাজে গবেষণার পরীক্ষা দেখাতে না পারলে আবিষ্কারকের আবিক্রিয়া স্বীকৃতি পেত না তখন; বাঙালীর উদাসীনতায়, বিদেশী সরকারের অবহেলায় ও অর্থের অভাবে ইউরোপে নিজের বেতার-যন্ত্রের পরীক্ষা দেখাতে পারেন নি সেদিন জগদীশচন্দ্র।

আবিষ্কর্তার সম্মান পেলেন ইতালির মার্কনি। যদিও তাঁর যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের পরে। কারণ তাঁর পক্ষে ইতালি থেকে লণ্ডনে গিয়ে নিজের তৈরী বেতার-যন্ত্রের পরীক্ষা দেখানো হয়েছিল সহজ ও সম্ভব। ১৯০৭ সালে তিনি তাঁর পেটেন্ট গ্রহণ করেন এবং বেতারের আবিষ্কর্তা রূপে গণ্য হন।

মার্কনি যান্ত্রিক কারিগর মাত্র—আর জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগর দুই-ই। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রই প্রথম উদ্ভাবন করেন বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনার কথা। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের পরীক্ষা লণ্ডনে দেখানো হয়নি বলে আবিষ্কর্তার যশ তিনি পাননি—পান মার্কনি।

ফরাসীর বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশচন্দ্রকেই বেতারের উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক বলে স্বীকার করেন। ফরাসীদেশে জগদীশচন্দ্রের বেতার যন্ত্রের যান্ত্রিক ব্যবস্থা বেতারে অনুসৃত হয়। আজও বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় তারই উদ্ভাবিত 'ক্রিষ্টাল সেট'।

লণ্ডনের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান "মুইর হেড এণ্ড কোম্পানি" বেতারে তারবার্তা প্রেরণে জগদীশচন্দ্রের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডঃ মুইর হেড নতুন আবিষ্কার গোপন রাখবার জন্য তাঁকে প্রচুর অর্থ দিতে চান। টেলিগ্রাফ কোম্পানী নামক আর একটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে লাভের অর্ধাংশের বিনিময়ে "পেটেন্ট" দিতে অনুরোধ করেন।

বিজ্ঞান জগদীশচন্দ্রের অন্তরের সাধনা—তা নিয়ে অর্থকরী ব্যবসা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এসব অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বেতার-যন্ত্রের কৌশল বিক্রয় করলে তিনি হতে পারতেন কোটিপতি।

জগদীশচন্দ্রের একজন মার্কিন বন্ধু তাঁর আবিক্রিয়া নিজের নামে "পেটেন্ট" করে লক্ষপতি হন। লণ্ডনের দুইজন বৈজ্ঞানিক ওয়েলার ও ম্যাণ্ডার্সন রয়াল সোসাইটিতে প্রেরিতে জগদীশচন্দ্রের 'উদ্ভিদের সাড়া' সম্পর্কীয় একটি রচনা চুরি করেন এবং অন্যত্র নিজের নামে ছাপিয়ে অর্থ লাভ করেন। নির্লোভ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। বিজ্ঞান তাঁর প্রাণের সাধনা। সে সাধনা তাঁর নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য নহে—দেশ জননীর সম্মানের জন্য···বিজ্ঞান লক্ষ্মীর আরাধনার জন্য,

বিজ্ঞান জগৎকে নতুন পথের সন্ধান দিবার জন্য। এই জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নির্লোভ, স্বার্থহীন সাধনা স্মরণ করে লিখলেন—

আর বার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে, বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে,
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ-শান্ত গুরুর বেদীতে।

॥ ঈথার ও অদৃশ্য আলো ॥

[১৮৯৪]

তখন বিদ্যুতের যুগ। সর্বত্র চলছিল বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা। জার্মানির অধ্যাপক হাজ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেই গবেষণা সম্পূর্ণ ও সফল হয় জগদীশচন্দ্রের হাতে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈদ্যুতিক গবেষণার বিবরণ লিখে পাঠান লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে। সোসাইটির পত্রিকাতে তা প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্র সোসাইটির কাছে থেকে বৃত্তি পান, এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধি পান (১৮৯৫)। দেখাদেখি ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ব্যয় বছরে আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

বায়ুর মত সূক্ষ্ম অদৃশ্য পদার্থ ঈথার। বায়ুর মত ঈথারও ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। শব্দ ভেসে আসে বায়ু তরঙ্গে, আলো ভেসে আসে ঈথার তরঙ্গে। আলোর রশ্মি পড়লে ঈথারের কম্পনের সৃষ্টি হয়। ঈথার-তরঙ্গের স্পন্দন চক্ষুতে অনুভূত হয় যখন তখন আমাদের আলোকজ্ঞানের সঞ্চার হয়।

আমাদের চক্ষু সাতটি রঙের আলো অনুভব করতে পারে। তাই বাইরে যে আলো আছে তা আমাদের চক্ষু অনুভব করতে পারে না। এর নাম **অদৃশ্য আলো**।

দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ ও অদৃশ্য আলোক তরঙ্গকে পৃথকীকরণ জগদীশচন্দ্রের আগে কেউ করতে পারেননি। জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত বিস্ময়কর এক যন্ত্রে এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হন।

জগদীশচন্দ্র অদৃশ্য আলোকের আবিষ্কারক।

আলোক যেমন ভেসে আসে ঈথার তরঙ্গে, বিদ্যুৎও তেমন ভেসে আসে ঈথার তরঙ্গে। আলোকের যেমন প্রতিফলন ও বিবর্তন আছে, বিদ্যুতেরও তেমন আছে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলেন এই তত্ত্ব। প্রমাণ করলেন আলোক তরঙ্গ ও বিদ্যুৎ-তরঙ্গ একই ঈথার স্পন্দন থেকে উদ্ভূত। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান জগৎকে দিলেন নতুন পথের সন্ধান। তারহীন বার্তাবহের উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁর আগেই লণ্ডনে পরীক্ষা দেখিয়ে ইতালির মার্কনি লাভ করলেন আবিষ্কারকের খ্যাতি।

এই ব্যর্থতার ফলে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে শুরু করলেন উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণা।

॥ উদ্ভিদের প্রাণ ॥

লজ্জাবতী লতা আঘাতে সাড়া দেয়। বড় গাছও আঘাতে সাড়া দেয় কিন্তু তা আমরা চোখে দেখতে পাই না। বড় গাছের এই অপ্রত্যক্ষ সাড়া বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে ধরলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি দেখালেন আহতস্থান থেকে সুস্থ স্থানের দিকে চলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। আঘাত বেশী হলে প্রবাহের মাত্রা বা শক্তি বেশী হয়। আহতস্থান সুস্থ হতে থাকলে বিদ্যুৎপ্রবাহও কমে।

গাছের সাড়া জানবার জন্য জগদীশচন্দ্র বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার

করেন। যন্ত্রের নাম "ক্রেসকোগ্রাফ" ও "স্বয়ংলেখ"। যন্ত্রের সংস্পর্শে গাছ সাড়া দেয়, আর সাড়ায় লিপি আঁকা হয়।

উদ্ভিদের দুরূহ জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন জগদীশচন্দ্র। ইউরোপের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতত্ত্বের বিরোধিতা করেন। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

॥ **জড়প্রাণ** ॥

জগদীশচন্দ্রের **জড়ে প্রাণ আবিষ্কার** বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অভিযান।

বেতার নিয়ে গবেষণার সময় জগদীশচন্দ্র জড়ে প্রাণ লক্ষ্য করেন। যে কলে তিনি পরীক্ষা করছিলেন তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের লেখার ভঙ্গী দেখে তার ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করা যায়। সেইরূপ চিহ্ন যন্ত্রের সাড়ালিপিতে লক্ষ্য করলেন জগদীশচন্দ্র।

একটু বিরামের পর যন্ত্র আবার সাড়া দেয়। বিশ্রামে মানুষের যেমন শ্রান্তি দূর হয়, যন্ত্রেরও সেইরূপ শ্রান্তি দূর হ'ল।

জড় ও উদ্ভিদের প্রাণ আবিষ্কারের গবেষণা এইভাবে জগদীশচন্দ্রের শুরু হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন—উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে যন্ত্রের সাড়া দেবার শক্তি বাড়ে এবং বিষ প্রয়োগে যন্ত্রের সাড়া দেবার শক্তি অন্তর্হিত হয়। প্রাণের প্রধান লক্ষণ সাড়া দেবার ক্ষমতা। জড়ে ও উদ্ভিদে তাঁর ক্রিয়া লক্ষিত হয়। আঘাত পেলে বা বিষাক্ত জিনিষের সংস্পর্শে এলে মানুষ ও প্রাণীর মত উদ্ভিদ এবং জড় ব্যথিত ও স্পন্দিত হয়।

নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্র ক্রেসকোগ্রাফের সাহায্যে তিনি দেখালেন ব্যাঙের পেশী, গাছের ডগা ও টিনের টুকরা বাইরের উত্তেজনায় অবিকল একই ভাবে অনুভব করে স্পন্দন।

জগদীশচন্দ্র বলেছেন ঃ

—জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত মাত্র। কোন কালে আকাশ-সাগরে অসংখ্য আবর্ত উঠে পরমাণুর সৃষ্টি হ'ল। তাঁদের মিলনে বিন্দু, অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। একই অণু কখনো মাটির আকারে, কখনো মানুষের শরীরে, আবার কখনো অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্তমান। কোন বস্তুরই বিনাশ নেই। শক্তিও অবিনশ্বর। প্রত্যেকটি কণা এই শক্তির দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এই মহাশক্তির স্রোত বিশ্ব জগৎকে মুহূর্তে ভাঙছে ও গড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ এই বিজ্ঞান দার্শনিককে সম্ভাষণ জানিয়ে তাই লিখেছেন একদিন—

বল "জয় নরোত্তম,
পুরুষ সত্তম
জয় তপস্বী-রাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে
জয় হে,
জয় হে,
জয় হে।"

॥ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ॥

জগদীশচন্দ্র ছিলেন খাঁটি আদর্শ বৈজ্ঞানিক। নির্লোভ, নিরলস সাধনার দ্বারা তিনি বিরোধীদের জয় করেন। আজ তাঁর উদ্ভিদ-তত্ত্ব সমগ্র বিশ্ব জগতে স্বীকৃত ও অনুসৃত।

পরীক্ষা দ্বারা অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা জগদীশচন্দ্রের ছিল লক্ষ্য। পরীক্ষার জন্য তিনি বহু সূক্ষ্ম-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এসব যন্ত্র তাঁরই উদ্ভাবিত এবং তাঁরই নির্দেশনায় দেশী কারিগর দ্বারা নির্মিত যন্ত্র আবিষ্কার জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বহু সূক্ষ্ম-যন্ত্রের উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র নিজ গবেষণার যন্ত্রপাতি সব তাঁরই উদ্ভাবিত। জীবের হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষার যন্ত্র **"গ্যালভানোমিটার"**।

উদ্ভিদের অনুভব শক্তি প্রমাণের যন্ত্র **"ক্রেসকোগ্রাফ"**।

গাছের সাড়া নির্ণয় করবার জন্য **"স্বয়ংলেখ যন্ত্র"**।

বেতারের যন্ত্র **"ক্রিষ্টাল সেট"**। আরও কত যন্ত্র। সব বিজ্ঞান তপস্বী জগদীশচন্দ্রের আজীবন সাধনার ফল।

জগদীশচন্দ্রের বাঙালী জীবনীকার জগদানন্দ রায় ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের অভিনবত্ব প্রকাশ করেছেন।

পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতগণের প্রচলিত মত খণ্ডন করে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনায় যে নতুন পথ প্রদর্শন করেছেন জগদীশচন্দ্রের ইংরাজ জীবনীকার অধ্যাপক গেডিস (Life and work of Sir J. C. Bose—P. Geddes)—লিখেছেন—

"অচিন্তনীয় মহাসত্যের কথা স্পর্ধার সাথে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সহায়তায় পাশ্চাত্য পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেনি আর কেউ কোন দিন।

ধর্মতত্ত্বে বাংলার সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ করেছেন বিশ্ব বিজয়। বাংলার আর এক সন্তান বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে করেছেন মহান্ দিগ্বিজয়।"

বাঙালী সাধকের বিশ্বজয়ী এই সাধনার সার্থকতা উপলব্ধি করে বাংলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি, জয়মাল্যখানি
সেখা হতে আনি
দীনা হীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে ॥
